সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

হেদায়েত হচ্ছে একটা আয়নার মতো যার ওপর পবিত্রতার আলো পড়লে তা থেকে আলোর প্রতিফলন হয়।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

অগ্রহায়ণ ১৪২১, নভেম্বর ২০১৪, মহরম ১৪৩৬

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

ইমান, আনুগত্য এবং বিয়ের অঙ্গীকার

আমীন : আপনি সেদিন সুরা নূরের ৬২ নং আয়াতটি উদ্ধৃত করে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আয়াতটিতে বিশ্বাসী বা মুমিন বলা হয়েছে তাঁদেরই, যারা কোনো সমষ্টিগত কাজে অংশগ্রহণ করলে রাসুলের (সাঃ) অনুমতি ছাড়া প্রস্থান করে না। আয়াতটির শানে নজুল যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন তাহলে আমার মতো অনেকেই উপকৃত হতেন।

গুরু : হুজুর পাকের (সাঃ) জামানায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসুলের সঙ্গে সাহাবিদের আচরণে আদবের খেলাফ হয়েছিল বলেই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল। অনেক সময় ধর্মীয় আলোচনা বা সমষ্টিগত কোনো মাহফিলে আগত কোনো কোনো সাহাবি হুজুর পাকের অনুমতি ছাড়াই চলে যেতেন। অন্তরঙ্গ সাহাবিদের অনেকেই আবার সময়ে অসময়ে তাকে বিরক্ত করতেন। রাসুলে পাকের শরাফত এমনই ছিল যে, তিনি মুখ ফুটে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। অনেকে তাঁর কাছে এসে বসেই থাকতেন, উঠবার নাম করতেন না। হাজার অসুবিধা হলেও রাসুলের মুখ দেখে বোঝা যেতো না যে তিনি কারো ওপর বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ নিজে যাঁর প্রেমিক– প্রেমাস্পদের এ অবস্থায় তিনি স্থির থাকতে পারেননি। সাহাবিদের মধ্যে হযরত কুমায়েল বিন যেয়াদ এবং মায়ায বিন জবল অন্তরঙ্গতার সুযোগে সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে আসতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গতার সুবাদে তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলে যেতেন। এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ মুমিনদের সাবধান করে দিয়ে এ আয়াত নাজিল করলেন– *ইন্নামাল মু'মিনুনাল্লাযি-না আ-মানু বিল্লা-হি ওয়া রাসু'লিহি ওয়া ইযা কা-নু মা'য়াহু আলা আমরিন জা-মিয়িল্লাম ইয়াযহাবু হাত্তা ইয়াসতা'যিনুহু ইন্নাল্লাযি-না ইয়াসতা'যিনুনাকা উলা–য়িকাল্লাযি-না ইউমিনু'না বিল্লা-হি ওয়া রাসু'লিহি ফাইযাস তা'যানুকা লিবা'দি শা'নিহিম ফা'যাল্লিমান শি'তা মিনহুম ওয়াসতাগফির লাহু-মুল্লাহা ইন্নাল্লা-হা গাফু'রুর রাহিম।* অর্থাৎ তারাই মুমিন যারা আল্লাহ এবং রাসুলে বিশ্বাস করে এবং কোনো মাহফিল থেকে রাসুলের অনুমতি ছাড়া চলে যায় না। যারা তোমার অনুমতি গ্রহণ করে তারাই আল্লাহ এবং রাসুলে বিশ্বাসী। অতএব তারা যখন কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্য অনুমতি চায় তখন তুমি নিজের ইচ্ছামতো যাকে খুশি অনুমতি দিও। তারপর তাদের হয়ে আমার ক্ষমা চেয়ে নিও। আল্লাহ পরম দয়াশীল। এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষ করার মতো। আমি তোমাদের প্রায়ই বলি, কুরআনের আক্ষরিক অনুবাদই কুরআনের হাকিকত নয়। এখানে দেখো, আক্ষরিক অনুবাদে একথা স্পষ্ট নয় যে, আল্লাহ কী পরিমাণ অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। আল্লাহ যে কোনো কোনো সাহাবির আচরণে অসন্তুষ্ট একথা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু শব্দের অনুষঙ্গ অনুসরণ না করলে এবং গভীরভাবে চিন্তা না করলে আল্লাহর অসন্তোষের মাত্রাটা বোঝা যাবে না।

লক্ষ করে দেখো, বলা হচ্ছে, তারাই মুমিন– তারা শব্দের পাশে এই ছোট্ট 'ই'টিকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ভুলে যেও না– তারাই মুমিন যারা আল্লাহ এবং রাসুলে বিশ্বাস করে– এর পরের 'এবং' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বাসের সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে রাসুলের অনুমতি প্রার্থনার ব্যাপারটিকে। এখানেই শেষ নয়– বলা হচ্ছে, নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাসী যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং এখানে আমরা একদিকে আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ লক্ষ করছি, অন্যদিকে দেখছি আল্লাহ ইমানকে রাসুলের আনুগত্যের সমান্তরালে স্থাপন করছেন। এখানে ইমান এবং আনুগত্য এক হয়ে গেছে। রাসুলের শর্তহীন গোলামি ছাড়া কোনো ইমানকে স্বীকার করা হবে না।

আমীন : হুজুর, রাসুলকে আমরা মানি ঠিকই কিন্তু তাঁর মর্যাদাকে অনেকেই ঠিক এভাবে বিচার করে দেখি না।

গুরু : রাসুলের মর্যাদা তো আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমার আমার স্বীকার করার ওপর তা নির্ভর করে না। একই আয়াতে প্রেমাস্পদের অবমাননায় ক্রুদ্ধ আল্লাহ কেমন অসহিষ্ণু হয়ে বলে ফেলছেন– হে রাসুল, ওরা যখন তোমার অনুমতি চায় তখন তুমি নিজের ইচ্ছামতো যাকে খুশি অনুমতি দাও এবং এই মূঢ় লোকগুলো, যারা তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বোঝে না তাদের হয়ে তুমি আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। এখানে আল্লাহ রাসুলকে অধৈর্য স্বরে বলছেন– এ ক্ষেত্রে তুমি আর আমার ওহির অপেক্ষা করো না। তোমাকেই অনুমতি দেবার ক্ষমতা দিয়ে দিলাম।

সুরা নূরের ৬৩ নং আয়াতটি পড়লেই বুঝবে আল্লাহ রাসুলের অবমাননাকে কী চোখে দেখছেন। যারা চুপে চুপে তাঁর অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে সে সমস্ত লোককে রাসুলের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে বলা হচ্ছে।

আমীন : হুজুর, তাহলে একথা স্পষ্ট যে, রাসুলে পাকের গোলামিই হচ্ছে ইমানের বুনিয়াদ– এছাড়া কোনো বিশ্বাস পূর্ণতা পেতে পারে না। হুজুর, একটা কথা মনে হচ্ছে রাসুলে পাকের প্রতি সাহাবিদের এই যে আদব, যার কথা এমন জোর দিয়ে বলা হচ্ছে– এ কি আমাদের জামানাতেও মুর্শিদের প্রতি মুরিদের আদব বলে গণ্য হবে না?

গুরু : অবশ্যই হবে। দেখ পীরি-মুরিদিকে তোমরা কিভাবে দেখো জানি না। তোমাদের অনেকে মুরিদ হয় নানা কারণে। তোমাদের পীরও পীরালি করেন নানা কারণে। সত্যিকারের মুরিদ পীরের কাছে কোনোদিন কিছু চাইবে না একমাত্র তাঁর ফায়েজ ছাড়া। সত্যিকারের পীরও মুরিদের কাছে হাত পাতবে না কোনো কিছুর জন্য। মুরিদের জন্য পীরের হাতে হাত দেয়াই রাসুলে পাকের হাতে হাত দেয়া। সেক্ষেত্রে মুরিদকে সেই পর্যন্ত আদব পালন করতে হবে যা সাহাবিরা রাসুলে পাকের সঙ্গে বজায় রাখতেন। এর খেলাফ হলে কুরআনের ঐ একই বিধান প্রযোজ্য হবে তাদের প্রতি যারা পীরের অমর্যাদা করে।

এ সম্পর্কটা অনেকটা বিয়ের মতো– বিয়ের সময় কনে যেমন অঙ্গীকার করে বরকে তার স্বামী বলে স্বীকার করে নেয়– এও তেমনি। এ এক ধরনের সুখময় দাসত্ব। এ বিয়ে যার হয় সেই জানে এ দাসত্বের জ্বালা কতোখানি। এ জ্বালা ছাড়া কেউ কি রাসুলে পাকের পদধূলি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে? ■

ইসলামে সুফি ভাবধারা

ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান

আসহাবে সুফফা কথা থেকেই মূলত সুফি শব্দের উৎপত্তি। সুফিবাদ ইসলামেরই এক অঙ্গ। ইসলাম ধর্মের কিছু মূল কথার প্রচার ও কিছু বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করবার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান মিলিত হয়ে কতগুলো রীতিনীতিকে জীবনে প্রতিফলিত করতে চান। এই দলটিই ইতিহাসের প্রথম সুফি। এঁদের বাসস্থান ছিল মদিনার মসজিদ-ই-নববির বারান্দা। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এঁরা মসজিদ ছেড়ে কোথাও যেতেন না। প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাও বলতেন না। সুফিরা সবরকম মলিনতা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখেন।

প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসুল (সাঃ)-কে সুফি সিলসিলার আদিগুরু হিসেবে ধরা হয়। পরম সত্তার প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে মরমীবাদ বলা যায়– ইসলামে যা ইলমে তাসাউফ নামে খ্যাত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসুরা খোদার সৃষ্টিকৌশল এবং প্রকৃতির বিবর্তনের ধারা উপলব্ধি করার জন্য একাকী এবাদতে মশগুল থেকে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। তাসাউফ শব্দের অর্থ আত্মা সম্পর্কীয় জ্ঞানার্জনের সাধনা। এ জ্ঞানপিপাসুরা সুফি নামে পরিচিত। অন্তরের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হয়ে এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সুফিরা হাকিকতের পরিচয় লাভের পথে এগিয়ে যান। তাসাউফের জ্ঞানলাভের মাধ্যমে জাগতিক লোভনীয় বস্তুর মোহ থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহপাকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া যায়। পরম সত্তা, বিশ্বজগৎ, মানুষের আত্মা এই সমস্ত বিষয় তাসাউফ বা সুফিবাদের মূল বিষয়। মানুষের আত্মার পরিশোধন সুফিবাদের শিক্ষা। সুফিরা মূলত শরিয়তসম্মত উপায়ে অন্তরের অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহপাকের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগের চেষ্টা করে থাকেন। সুফিবাদ হৃদয় থেকে জ্ঞাত আত্মোপলব্ধিমূলক মতবাদ। সুফি সাধক খোদা প্রেমের আগুনে তার ইন্দ্রিয়জ ইচ্ছাসমূহ দাহ করে নফসানিয়াত ও রুহানিয়াতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারেন। তাঁদের মতে, শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করত জাগতিক বস্তুর লোভ পরিত্যাগ করে বিশ্বনিয়ন্তার সান্নিধ্যে আত্মসমর্পণই মূল কথা। আল্লাহপাক পরম প্রেমিক। তিনি মাশুক আর মানুষ আশেক। তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রীতি এবং ভালোবাসার। তাই তিনি মহাপরাক্রমশালী শাসক নন তিনি মানুষের অন্তরের একান্ত আপন। সুফি সাধনায় প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে মিলনের সেতুই হলো প্রেম। সুফি সাধকদের কাছে প্রেমই ধর্ম। সুফির জীবনে তাই আল্লাহর প্রেমলাভ ও দয়াই প্রধান কাম্য।

মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হলো আল্লাহর প্রেমলাভের মাধ্যমে নিজেকে পরম শক্তিশালী করে তোলা। সুফি সাধনার বিষয় হলো সমাজে অবস্থান করেও সবসময় সমাজ জীবনের যাবতীয় পঙ্কিলতার উর্ধ্বে থেকে পরমাত্মার পরিচয় লাভ, পরম সত্তার সন্তুষ্টি বিধান এবং একই সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনের মারেফতের অপার্থিব অপার আনন্দের ভাবসাগরে অবগাহনের আকাঙ্ক্ষায় শ্বেত-শুভ্রতায় অনুক্ষণ একান্ত সাধনায় মগ্ন থাকা।

একদিকে চলমান সমাজ জীবনের যাবতীয় অনিয়ম-অবিচার, দুর্নীতি, অমানবিক কাজকর্ম, সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশিত পথের বিরুদ্ধে ষড়রিপুর তাড়নায় যাবতীয় গর্হিত পন্থায় উপার্জন ও বিলাস-বৈভবের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণ – অন্যদিকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে সৎ, মানবিক পন্থায় কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে সহজ-সরল জীবিকা নির্বাহের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে এই দুটোর মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানতে শেখান যথার্থ সুফি সাধক ও এই পথের নিষ্ঠাবান পথিকেরা।

দুধ আর পানির মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ পানি বাদ দিয়ে শুধু দুধটুকু গ্রহণের যে রহস্যপূর্ণ কৌশল সৃষ্টিকর্তা রাজহংসকে দিয়েছেন তেমনি সুফিদের মধ্যেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাহাত্ম্যপূর্ণ আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদান করেছেন– যার ফলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ম-অনিয়মের, সত্য-মিথ্যার, ন্যায়-অন্যায়ের ভেদরেখা টেনে সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি গ্রহণ করতে সক্ষম হন অবলীলাক্রমে।

বর্তমানের বস্তুবাদী জগতে বস্তুর চমৎকারিত্বে ও মোহে সাধারণ মানুষ আকর্ষিত হয়ে সুফি সাধকদের কথা ভুলতে বসেছে। মানুষ তার ভেতরের শক্তি না খুঁজে বাইরের বিলাসে গা ভাসিয়ে সুখ খুঁজে ফিরছে– কিন্তু সে সুখ ক্ষণিকের, প্রকৃত সুখ বাইরের আয়োজনে নয়, অন্তরের প্রয়োজনে– এ কথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছে। চলমান সুখের জ্বালা, বেদনা, হতাশাকে তাই ঢাকতে মানুষ চরম নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

গোটা পৃথিবীজুড়ে আজ তাই ঘুমপাড়ানী ওষুধের সাম্রাজ্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি যে সুফিতত্ত্ব অর্থাৎ আল্লাহর প্রেম-সাধনা– সে কথা চিন্তা করতে বা সে কথায় নির্ভর করতে আজকের মানুষ ভয় পায়। তাই সুফি সাধনার দ্বারাই এই বিশ্বাস ও সামর্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমীন। ■

সালমান (রা.) যেভাবে সত্য-ধর্ম ও বিশ্বনবীকে (সাঃ) চিনেছিলেন

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর অতি প্রিয় ও অনুগত সাহাবি হযরত সালমান ফার্সি (রাঃ) ১৪০০ বছর আগে ৩৫ হিজরির ৮ সফর ইরাকের মাদায়েন শহরে ইন্তেকাল করেছিলেন।

সেখানে আজও তাঁর মাজার জিয়ারত করেন উৎসুক, ধর্মপ্রাণ, ঐতিহ্য-প্রিয় ও শেকড়-সন্ধানী মুসলমানরা। হযরত সালমান ফার্সি (রাঃ)-এর অতি উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরতে গিয়ে রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন : 'সালমান মিন্না আহলি বাইত' । এর অর্থ সালমান আমাদের আহলে বাইতের (পবিত্র নবী বংশের) অংশ। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও তিনিই একমাত্র সাহাবি যাকে রাসুল (সাঃ) নিজ পবিত্র পরিবারের সদস্য বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত সালমান (রাঃ) ছিলেন অনারব ও ইরানের শিরাজ অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর আরেকটি নাম ছিল রুজবেহ। জরথুস্ত ধর্মের অদ্ভুত প্রথায় বিতৃষ্ণ সালমান মাতৃভূমি শিরাজ ত্যাগ করে সত্য-ধর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। নেস্তোরিয়ান খ্রিস্টানদের সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর সত্য-সন্ধানের এই ভ্রমণ শুরু করেন তিনি।

ব্যাপক ভ্রমণের পর তিনি সিরিয়ায় কয়েকজন সন্ন্যাসীর কাছে একত্ববাদের শিক্ষা পান। এই সন্ন্যাসীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি একত্ববাদী ধর্মের ওপর অটল থাকার জন্য লোকালয় ছেড়ে নির্জন মরুভূমিতে বসবাস করছিলেন। কারণ, খ্রিস্টধর্মের নেতা সেজে বসা পল (মূলত ইহুদি) একত্ববাদী খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলকে বিকৃত করে এতে অযৌক্তিক ত্রিত্ববাদ চালু করেন। খাঁটি খ্রিস্টধর্মে (একত্ববাদী) বিশ্বাসী ওই সন্ন্যাসীরা যখন একে একে মারা যাচ্ছিলেন তখন তাদের মধ্যে বেঁচে থাকা সর্বশেষ সদস্য মৃত্যুবরণের মুখে সালমান (রাঃ)-কে আরব দেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সালমান (রাঃ) যেন শেষ নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত আরব দেশে থেকে যান সেই পরামর্শ দিতেও ভুল করেননি সেই সন্ন্যাসী।

সালমান (রাঃ) আরব দেশে আসলে ইহুদিরা তাঁকে অপহরণ করে এবং তাঁকে দাস হিসেবে বিক্রি করে। বহু বছর ধরে তিনি ইহুদি মালিকের জন্য খেজুর বাগান গড়ে তুলতে ব্যাপক পরিশ্রম করেছিলেন।

একদিন তিনি খেজুর বাগানে দেখলেন নুরানি চেহারার এক ব্যক্তি একত্ববাদ ও ঐশী ন্যায়বিচারের কথা বলছেন। সালমান (রাঃ)-এর হৃদয়ে জ্বলে উঠলো আলোর স্ফুলিঙ্গ। আগন্তুক ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য সদকা বা দান হিসেবে কিছু খেজুর দিতে চাইলেন তিনি। কারণ, তিনি ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলেন যে শেষ নবী (সাঃ)-এর অন্যতম নিদর্শন হলো তিনি এবং তাঁর বংশধরদের জন্য দান-খয়রাত ও সদকা নেয়া নিষিদ্ধ। রাসুল (সাঃ) দান করা খেজুরগুলো তাঁর সাহাবিদের দিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এবং সঙ্গে থাকা চাচাতো ভাই ও জামাতা হযরত আলী (রাঃ) বিনম্রভাবে জানান যে তাঁরা দানের খেজুর নেবেন না। সালমান (রাঃ)-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বেহেশতি আনন্দে! মনে মনে বললেন : 'আরে! একেই তো আমি খুঁজছি এতোদিন!' এবার তিনি কিছু খেজুর নিয়ে সেগুলো রাসুল (সাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-কে উপহার হিসেবে পেশ করলে তাঁরা তা গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত সালমান (রাঃ) উচ্চারণ করলেন দুটি বাক্য– আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু বা মাবুদ নেই এবং মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল।

মহানবী (সাঃ) ওই কৃপণ ও অর্থপিশাচ ইহুদিদের হাত থেকে নও-মুসলমান সালমান (রাঃ)-কে মুক্ত করার জন্য বিপুল অর্থ শোধ করেন এবং তাদের আরো কিছু কঠোর শর্ত পূরণ করলেন।

মক্কার দশ হাজারেরও বেশি মূর্তি পূজারি মুশরিক ও ইহুদি একজোট হয়ে যখন ইসলামকে নির্মূলের লক্ষ্যে মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ নেয় তখন পবিত্র এই শহরের চারদিকে সবচেয়ে অরক্ষিত দিকগুলোয় খন্দক বা পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন এই বিখ্যাত সাহাবি। রাসুল (সাঃ) তাঁর ওই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধক্ষেত্রে খন্দকের ব্যবহার আরব অঞ্চলে ছিল অপ্রচলিত। এমন অপ্রত্যাশিত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দেখে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

বিশ্বনবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত সালমান ফার্সি (রাঃ) সব সময় আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (রাঃ)-এর অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসে। সালমান (রাঃ) মাদায়েন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই প্রদেশ ছিল ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রাচীন ইরানের সাসানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। ■

সুত্র: আইআরআইবি

"আমি কে, কী করি : আমি আত্মার প্রতিনিধি" লেখাটির শেষ কিস্তি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে
- নির্বাহী সম্পাদক

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা

কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামী

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা– এই লেখাটি কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামীর ‘বেহুঁশের চৈতন্য দান’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ ফানাফিল্লাহ বা নির্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের হাল (অবস্থা) বিভিন্ন রকম থাকতে পারে অবশ্যই, তাতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই এবং তাঁদের এই হাল-হাকিকত সাধারণ মানুষের বোধগম্যের ভেতরে নাও থাকতে পারে। তাঁদের ব্যাপারে মন্দ কোনো মন্তব্য করাই অজ্ঞতার পরিচয়। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানি (রহঃ) তাঁর ‘আল ফাতহুর রাব্বানি ওয়া ফায়জুর রাহমানি’ কিতাবের ২৯৯ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন : মুনাফিক, দজ্জাল ও প্রবৃত্তির পূজারীরাই সালেহিনদের (পীর-আউলিয়াদের) এ হালতের প্রতি অবিশ্বাসী। কারণ, তাদের পরিচয় আল্লাহ এবং অন্য ওলি-আউলিয়ারাই কেবল জানেন। আল্লাহতে বাস করা এ ধরনের বান্দাদেরই বলা হয় ‘ফকির’ (আমিত্বশূন্য ব্যক্তি)।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন : ‘ফকিরি আমার গৌরব’– এটা রাসুলের সতের সুন্নতের একটি এবং এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা। রাসুল (সাঃ) এ ফকিরি হালত গ্রহণ করে পরে তাঁর স্ত্রীদের বিষয়টি অবগত করতে প্রথমে দ্বিধাবোধ করলেন, তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করবেন তাই ভেবে। নাকি তালাক নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করবেন? শেষে ভেবেচিন্তে তাঁদের সামনে কথাটি পেশ করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথমে একটু অমত হলেও শেষে সবাই ফকিরি হালত গ্রহণ করে নিলেন (খায়রুল মাজালিস, ২৩৬-৩৮ পৃঃ)। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের সমস্ত মহাপুরুষ বা রাসুলই ছিলেন ফকির এবং তাঁরাই হলেন পতিত (আমিত্বের আবরণে আবৃত) মানব জাতির পথপ্রদর্শক তথা মুর্শিদ এবং হাকিকতে কাবা। আমাদের সমাজে ‘ফকির’ কথাটির মর্ম বিকৃতভাবে প্রচার করে বোঝানো হয়েছে যে, ফকিরদের ক্রিয়াকর্ম ইসলামের বহির্ভূত এবং অন্ধ, বোবা, বধির মৌলবিরাই এ ধরনের প্রচারের মূল কর্তা।

একদিন জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি নবুয়তের সঙ্গে দুনিয়া কবুল করবেন না ফকিরির সঙ্গে? রাসুল (সাঃ) ফকিরিকে গ্রহণ করে নিলেন (খায়রুল মাজালিস, ১৫৭ পৃঃ)। যিনি কায়েমি ভাবে আল্লাহতে বাস করেন তিনিই ফকির তথা সমস্ত রাসুলই হলেন আল্লাহর ফকির– এ ভেদ সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ তারাই পীর-ফকির সম্বন্ধে মানুষকে ভুল ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করে থাকে। কুরআনে আল্লাহর ফকিরদের (যারা সাধক) সাদকা দেবার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা উত্তম এবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। *‘লিল ফুকারা–য়িল্লাজি-না উহসিরু ফি সাবি-লিল্লা-হি লা-ইয়াসতাতিউনা দারবান ফিল আরদি ইয়াহসাবুহুমুল জা-হিলু আগনিয়া–আ মিনাত্তায়াফফুফি।’* অর্থাৎ এটা (সাদকা) ফকিরদের (তরিকতপন্থীদের) জন্য। যারা আল্লাহর রাস্তার মধ্যে অবরুদ্ধ, তারা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। জাহেলরা (অজ্ঞরা) তাদের (ফকিরদের) নিবৃতভাবে দেখে ধনবান মনে করে (সুরা বাকারা/২৭৩)।

আল্লাহর এ নেককার বান্দা ইনসানুল কামেলদের খেদমত করা এবাদত। যেমন, বড়পীর আবদুল কাদের জিলানি (রহঃ) তাঁর ‘আল ফাতহুর রাব্বানি ওয়া ফায়জুর রাহমানি’ কিতাবের ৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন : ‘নেককারদের বা ইনসানুল কামেলদের খেদমতে থাকা যদি তোমার সম্ভব হয়, তবে এটাই তোমার জন্য ইহকাল ও পরকালে মুক্তির জন্য শতগুণে শ্রেয় হবে।’ হযরত খাজা ওসমান হারুনি (রহঃ) বলেছেন : *‘খুশা রিনদি কে পামালাশ কুনাদ সাদ পার সায়েরা, সাহেবে তাকোয়াকে মান বা জুব্বা ও দাসতার মি রাকসাম।’* অর্থাৎ শত ফরজ এবাদত থেকেও পীরের পদতলে পড়ে থাকাকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ, *তাঁর তাকোয়ায় ডুবে কেবল আমিই নাচি না বরং আমার জুব্বা দাসতারও নাচে।’* হযরত খাজা শায়েখ ফরিদউদ্দিন মাসুদ গঞ্জে শাকর (রহঃ) তাঁর ‘ইসরারুল আউলিয়া’ কিতাবের ৫৫ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন : ‘খালেস অন্তরে একদিন পীরের খেদমত করা হাজার বছর নফল বন্দেগির চেয়েও অধিক পুণ্যের কাজ।’ (চলবে)

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

এ গ্রন্থে রয়েছে হুজুর জৌনপুরির (রহঃ) নিজের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত প্রায় সমস্ত রচনা এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের লেখাসহ হুজুরের দুর্লভ ছবিসহ অ্যালবাম। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ।

পনের শ’ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল্য ১,৫০০ টাকা। আগ্রহী পাঠক ও ভক্তবৃন্দের জন্য রয়েছে ২০% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা। আপনি সংগ্রহ করুন এ মহামূল্যবান স্মারক গ্রন্থ। আপনার সংগ্রহে রাখা এ গ্রন্থটিই হবে সুন্দর ও সত্য পথে চলার পাথেয়।

প্রাপ্তিস্থান : **পাঠক সমাবেশ**, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।

ডা. হাবিবুর রহমান - মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬

আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।